সূচীপত্র

পাঠকের চোখে	৫
অপ্রকাশিত রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি ঃ সুন্দর-বনের বাঘ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭
গঙ্গাসাগর মেলা ঃ শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য	১১
গঙ্গাসাগর যাত্রার পুণ্যপথ, একাল-সেকাল ঃ স্বপন মন্ডল	১৫
সমাচার দর্পণ, উইলিয়াম কেরী এবং গঙ্গাসাগর ঃ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯
গঙ্গাসাগর ঃ অজয় কেলার	২৩
অমিত ধরের ক্যামেরায় সাগরমেলা	২৪
ছন্ন ভবঘুরের চোখে গঙ্গাসাগর ঃ সৈকত মুখার্জী	২৬
মেলা মাছি, মাছির মেলা ঃ ডঃ শুভ্রকান্তি সিন্‌হা	২৯
সুন্দরবনের জার্নাল ঃ ড. প্রণবেশ সান্যাল	৩১
আমার জীবন আমার সুন্দরবন ঃ তুষার কান্তিলাল	৩৩
বাংলাদেশের বাদাবন বলছি ঃ সুরেশ কুন্ডু	৩৫
সুন্দরবনের প্রাণি ঃ রিসাস বাঁদর ঃ ড. অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়	৩৭
সুন্দরবনের উদ্ভিদ ঃ ধুঁদুল ঃ সৌমিক মিত্র	৩৮
সুন্দরবনের বই ঃ একটি প্রশংসনীয় ও আন্তরিক উদ্যোগ ঃ শুভদীপ অধিকারী	৪০
সুন্দরবন ঃ ঘটনাপঞ্জী ঃ (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১১)	৪১

Download
Full Edition
at
Rs. 50/-
only

নামাঙ্কন ঃ দেবব্রত ঘোষ
প্রচ্ছদ ঃ সৈকত মুখার্জী
সূচীপত্রের ছবি ঃ নিজস্ব

অপ্রকাশিত রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি

নন্দলাল বসু অঙ্কিত 'সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ'

সুন্দর-বনের বাঘ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের পদার্পনে ধন্য হয়েছে সুন্দরবন অথচ সুন্দরবন বিষয়ে তাঁর কোনও লেখা নেই—সুন্দরবনের মানুষের এ দুঃখ ভোলবার নয়। ১৯৩২ সালের ২৯ ডিসেম্বর শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে পোর্ট ক্যানিং ও ক্যানিং থেকে লঞ্চে হ্যামিল্টনের কর্মকেন্দ্র গোসাবায় পৌঁছান তিনি। তিন দিন সুন্দরবনের আতিথ্যে কাটিয়ে পয়লা জানুয়ারি কলকাতা ফিরে যান। সমবায় বা পল্লী-সংগঠন ভাবনার কোথাও কি স্থান পেতে পারত না হ্যামিল্টনের বিপুল কর্মযজ্ঞের কোনও দিক!

'সুন্দর-বনের বাঘ' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে *চিত্র বিচিত্র* গ্রন্থের 'বিচিত্র' পর্যায়ে। *সহজপাঠ* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের জন্য যে সব কবিতা লেখা হয়েছিল তার সবগুলি *সহজ পাঠ* এ নেওয়া হয়নি। বর্জিত কবিতাগুলি *চিত্র বিচিত্র* তে স্থান দেন শ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ-ভুক্ত নানা পাণ্ডুলিপি থেকে *চিত্র বিচিত্র*র নতুন রচনাগুলি সংগ্রহ করেন শ্রী কানাই সামন্ত। *সহজপাঠ* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। তার ঠিক আগে রচনাগুলির কয়েকটি লেখা হয়। সহজপাঠ রচনা শুরু হয়েছিল ১৮৯৪-৯৫ সালে। 'সুন্দর-বনের বাঘ' রচনাটি *সহজপাঠ* রচনা কালের প্রথম পর্যায়ে না দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখা তা নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। তবে রচনাটি রবীন্দ্রনাথের গোসাবা ভ্রমণের আগে লেখা বলাই যায়। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে চিত্র বিচিত্র-র পাঠে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। এখানে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মুদ্রিত পাঠটিও গ্রহণ করা হল।

চিত্র বিচিত্র-র বিচিত্র অংশে 'এক ছিল বাঘ' নামে বাঘ বিষয়ক আরও একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তবে একই কবিতা ক্ষিতীশ রায় সম্পাদিত *সহজপাঠ* তৃতীয় ভাগে (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৭) 'মোটা কেঁদো বাঘ' নামে আগেই প্রকাশিত হয়েছে। 'সুন্দর-বনের বাঘ' *সহজপাঠ*-এ প্রকাশিত হলে বাংলার ঘরে ঘরে তা পৌঁছে যাবার সুযোগ ছিল। এখানেও সুন্দরবন বঞ্চিত। সঙ্গে *চিত্র বিচিত্র* গ্রন্থের প্রচ্ছদে নন্দলাল বসু অঙ্কিত বাঘ। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র ভবন (শান্তিনিকেতন) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সংকলন – *সুজিত কুমার মণ্ডল*

ছবি ঃ লেখক

মন্দির সমুদ্রের ভাঙনে স্থায়ী হয়নি। বর্তমান মন্দিরটি বাংলার ১৩৮০-৮১ সনে রাজ্য সরকার তৈরি করেছেন। বর্তমান মন্দিরে শেষরাতের মঙ্গলারতি থেকে রাতে শয়নারতি পর্যন্ত মোট পাঁচবার পূজা হয়।

সাগর মেলা মূলতঃ পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে হলেও মেলার আগের দিন থেকে মেলার মাঠ সর্বভারতীয় মানুষে পূর্ণ হয়ে যায়। সংক্রান্তির আগের দিন বাউনির স্নান, সংক্রান্তির দিন মকর স্নান, আর সংক্রান্তির পরের দিন চলে উত্তরায়ণের স্নান। উত্তরায়ণের স্নান সেরে মানুষ বাড়ির পথ ধরে। মেলার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় একমাস আগে থেকেই। প্রশাসন কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। বড় বড় কর্তাদের একমাসের স্থায়ী আস্তানা হয়ে ওঠে সাগর দ্বীপ। প্রশাসনের সাথে হাত মেলায় বিভিন্ন সংগঠন। বিশেষ করে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, রেড ক্রশ, সেন্টজন এ্যাম্বু লেন্স, ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস, বজরং পরিষদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও হাত লাগান এই মেলাকে সার্থক করার জন্য। পুরাণ বর্ণিত কাহিনী হলেও গঙ্গাসাগর মেলার ইতিহাস বেশি প্রাচীন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গাসাগর দ্বীপে জনবসতির কোন খবর পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৃটিশ রাজত্বে সাগরদ্বীপে জঙ্গল কেটে বসতি শুরু হয়। বসতি শুরু হওয়ার পর অযোধ্যার রামানন্দ পন্থী মঠের প্রতিনিধিরা গঙ্গাসাগরে এসে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পূজার্চনা শুরু করেন। এই সময় থেকেই অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই মেলা শুরু বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এর আগে মেলার কোন খবর নেই।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রভাব পড়ে হাওড়া স্টেশন, কলকাতা বাবুঘাট সহ গঙ্গার অন্যান্য ঘাট, শিয়ালদহ স্টেশনে। দূরদূরান্ত থেকে সাধু সন্ন্যাসীর দল আগেই এসে আস্তানা জমান গঙ্গার ধারে। কনকনে ঠান্ডায় সেখানে চলে পূজা-পাঠ, হোম-যজ্ঞ প্রভৃতি। এই বিশাল জনস্রোত আছড়ে পড়ে গঙ্গাসাগর দ্বীপে। ট্রেনে, রিজার্ভ বাসে, রুটের বাসে সবাই মেলামুখী। হারউড পয়েন্ট থেকে মেলার জন্য বিশেষ লঞ্চ চলে। এই সময় অনেকে নামখানা থেকেও লঞ্চে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে রিজার্ভ লঞ্চে সাগর দ্বীপে পৌঁছান, চারিদিকে শুধু মানুষের মাথা। বিভিন্ন বয়সের বিশেষ করে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর দ্বীপভূমি ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে। যে ভারতবর্ষ এক অনাবিল আনন্দের ভারতবর্ষ, এক পূণ্যকামী মানুষের ভারতবর্ষ। সহজ সরল মানুষের ভারতবর্ষ।

মেলার কদিন চলে গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজো, পিতৃতর্পণ, বৈতরণী পার প্রভৃতি। কত ব্রাহ্মণ পুরোহিত এই সময় উপস্থিত হন কিছু লাভের আশায়। কেউ শুধুই একটি গরু নিয়ে বৈতরণী পার করিয়ে উপার্জন করেন, এখনও অনেক মানুষ সাগরে সোনা, রূপা, পয়সা সহ অন্যান্য জিনিস নিবেদন করেন। জল থেকে

সমাচার দর্পণ, উইলিয়াম কেরী এবং গঙ্গাসাগর

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

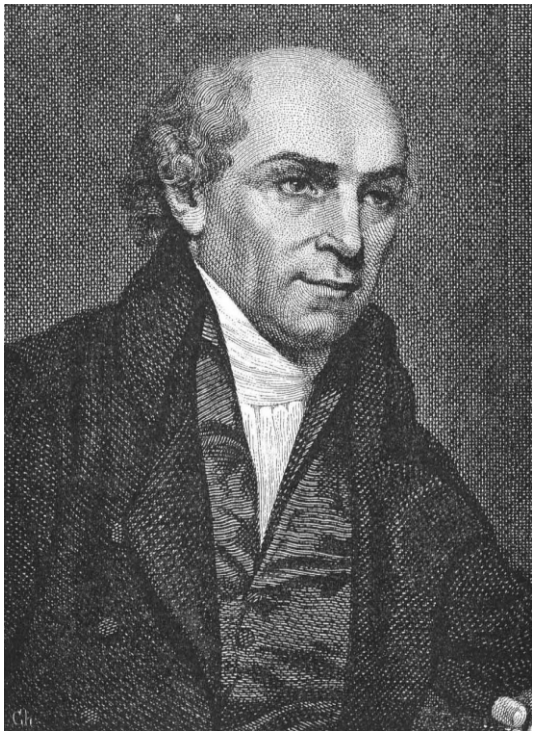

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাঙলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যে নবজাগরনের জোয়ার এসেছিল তাতে শ্রীরামপুর মিশন থেকে জনচেতনা সৃষ্টিতে সংবাদপত্র প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। নানা কারণে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারের নিষেধ থাকায় শ্রীরামপুর মিশন প্রথমে সংবাদপত্র প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে মিশনের জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পদনায় ও কেরীসাহেবের অনুমোদনে বাঙলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশ পায়। ঐতিহাসিক দিক থেকে কিছু সমসাময়িক সংবাদ সম্বলিত এই দিগ্‌দর্শন কেই প্রথম বাঙলা ভাষার সংবাদপত্রের জনক বলা যায়। ইংরেজ সরকারের কোন বাধা না আসায় ঐ বছরই ২৩শে মে, শনিবার দিন শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে জন ক্লার্কের সম্পদনায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করা হোল। ১৮২৯ সালের ১১ই জুলাই থেকে ১৮৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই পত্রিকা ইংরেজি-বাঙলা দ্বিভাষিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় দুই দশক ধরে এই পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পায়। শ্রীরামপুর কলেজের কেরী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ১৮১৮ সালের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত গঙ্গাসাগর সম্পর্কিত সংবাদ সমূহ এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গঙ্গানদী উত্তর ও পূর্ব ভারতের নানাস্থানে পরিক্রমা করে আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে শেষে কলকাতার দক্ষিণে সাগরে বিলীন হয়েছে। সাগর সংগম অঞ্চলই গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত। এই গঙ্গাসাগর দ্বীপের সুন্দরীগাছের বন কেটে বসতি গড়ার জন্য ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কলকাতার টাউন হলে (তৌনহালে) বেশ কয়েকজন ইংরেজ সাহেব জমায়েত হন। সমুদ্রতীরের জলহাওয়া রোগগ্রস্থ মানুষের বায়ু পরিবর্তনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিদেশী সাহেবরা রোগ মুক্তির জন্য জাহাজে অন্য দেশে চলে যেতে পারেন। কিন্তু এদেশীয় মানুষ (সম্ভবতঃ জাত যাওয়ার ভয়ে) জাহাজে চড়ে অন্য দেশে যেতে পারেন না। সুতরাং গঙ্গাসাগরে বসতি হলে এদেশীয়রা সেখানে গিয়ে রোগমুক্ত হয়ে ফিরে আসতে পারেন। এইসব আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যরা কোম্পানী স্থাপন করে দুশো জন সভ্য (যার অর্ধেক ইংরেজ, বাকি অর্ধেক এদেশীয়) প্রত্যেকে একহাজার টাকা জমা দিলে দু'লক্ষ টাকায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে অনুমান করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর এই খবর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়। তার আগে ৩রা বা ১০ই তারিখ বৃহস্পতিবার। (সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার ছাপা হোত, কিন্তু কিছুদিন সপ্তাহে দুদিন আর তারপর আবার সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হোত) 'বৃহস্পতিবারের সমাচার পত্রে' লেখা ছিল যে কুড়ি বছর আগে এখানকার লোকেরা বন কেটে বসতি করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু 'সেখানে' ব্যাঘ্রেরা আপনাদের 'পৈতৃকাধিকার' নিষ্কন্টকে ভোগ করিতেছে, 'তাহাতে তাহারদের বিপক্ষ কেহই হয় নাই' বলিয়া সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। এইদিন টাকা জমা ও জমি বন্টনের বিষয়ও আলোচিত হয়। স্থির হয় যে বনকাটার একশ পঞ্চাশ অংশের মধ্যে এক এক হাজার টাকা করে প্রত্যেকের অংশ যখন সকলে দেওয়া মনস্থ করবে তখন প্রথমে ঐ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ জমা দেবে। ছ'মাসের পর দ্বিতীয় ভাগ, আর বৎসারান্তে বাকি অংশ দিতে হবে। তারপর প্রথম কুড়ি বছর বিনা রাজস্বে ও পরবর্তীকালে 'বিঘাভূমি চারি আনা' হিসাবে কেবল রাজস্ব নেওয়ার শর্ত মানার মর্মে কোম্পানীর আধিকারিকের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হবে। তাছাড়া সম্মত এদেশীরা ইংরেজ ও বাঙালী এই দুই সম্প্রদায়ের 'উভয় পক্ষের পরস্পর জিগীষা হইবেক' এই আশঙ্কায় তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গঙ্গাসাগরের উত্তরভাগে বাঙালী লোকেরা ও দক্ষিণভাগে

অমিত ধরের ক্যামেরায়
সাগরমেলা

অ
১৯৮০ সা

ছবি ঃ সৈকত মুখার্জী

মেলা মাছি, মাছির মেলা

ড. শুভ্রকান্তি সিন্‌হা

বলা হয় সুন্দরবনে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। যদি বলি সুন্দরবনে জলে মাছ ডাঙায় মাছি! খুব একটা আশ্চর্য হয়তো শোনাবে না! এমনিতেই সুন্দরবনের প্রায় সব অংশটা জুড়েই মাছির আধিক্য। কিছু কিছু দ্বীপে আবার মাছির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এর কারণ ছোট বড় নদী-খালের পাড়ে পাড়ে বিভিন্ন প্রাণির মৃতদেহ, মাঠে-ঘাটে মরা শামুক, কাঁকড়া, মাছিদের পর্যাপ্ত পরিমানে বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর মেলার ভিড় সামলাতে নাজেহাল হতে হয় প্রশাসনকে। স্থানীয় অধিবাসী, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের অধীনে একাধিক বিভাগ তোড়জোড় শুরু করে প্রায় ছ'মাস আগে থেকে। বিভিন্ন কমিটি তৈরি হয়, তৈরি হয় একাধিক স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীর থাকার জন্য তৈরি হয় অস্থায়ী কুটির, ব্যবস্থা হয় পানীয় জলের। আর অত্যন্ত আবশ্যক যে ব্যবস্থাটি হয়, তা হল 'টেম্পোরারি টয়লেট'-সাময়িক ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী মল-মুত্রালয়।

খাদ্য এবং পানীয় জল অত্যন্ত আবশ্যকীয় দুটি জিনিস। মেলায় মল-মুত্রালয় ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা যেমন দরকারী, স্বাস্থ্য সম্মত ও বৈজ্ঞানিক মল-মুত্রালয় বোধকরি ততটাই জরুরী। গঙ্গাসাগর মেলায় লাখ লাখ লোকের ব্যবহারের জন্য 'অস্থায়ী মল-মুত্রালয়ের' আয়োজন দেখে অবাক হতে হয়। মেলা প্রাঙ্গনের কিছুটা দূরে অগভীর গর্তের ওপর সিমেন্টের স্ল্যাব বসিয়ে তৈরি হয় অস্থায়ী মল-মুত্রালয়। মেলা যতদিন চলে, প্রতিটি গর্তে জমা হতে থাকে মল।

পূণ্য স্নান শেষ হলে পূণ্যার্থীরা সব নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান, সাধু-সন্ত, পূণ্যার্থী, সাধারণ মানুষের স্মৃতি চিহ্ন হয়ে টন টন মল আর ময়লা জমে থাকে বালির নিচে। প্রকৃতির নিয়মে তা পরিবর্তিত হবে অজৈব উপাদানে। কিন্তু তার আগেই ভন্ ভন্ করে উড়তে উড়তে মাছির দল এসে পড়ে। গঙ্গাসাগর মেলার অব্যবহিত পরেই এ তল্লাটে মাছির সংখ্যা বেড়ে যাবার প্রধান কারণই হল জমে থাকা মল। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে শুধুমাত্র মাস্‌কা গনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির মাছির সংখ্যা

ছবি ঃ অনুপম কোলে

রিসাস বাঁদর

ড. অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

বাঁদরের প্রসঙ্গ উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় 'বাঁদরামি' শব্দটি। ছোটরা বদমাসি করলেই বড়রা শাসনের সুরে বলে ওঠেন 'বাঁদরামি করিস না' কিম্বা 'বাঁদর কোথাকার' ইত্যাদি। অথচ এই বাঁদরই শ্রী রামচন্দ্রের একান্ত অনুগত অনুচর এবং পরম ভক্ত। যদিও রামভক্ত 'হনুমান' শব্দটি ব্যবহার করা হয় অথচ যে মূর্তি ছবি আমরা পূজিত হতে দেখি, তার সঙ্গে মুখ কাল হনুমানের গরমিলটাই বেশি। বরং বলা ভাল বাঁদরের মূর্তিই পূজিত হচ্ছে হনুমান নামে।

বাঁদরকে আধুনিক কালে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। মহাকাশ গবেষণার এক বড় সাক্ষী এই বাঁদর। প্রথম মহাকাশ যাত্রীদ্বয়ের একজন এই বাঁদর। নাম Able। মানুষের রক্তের একটি গ্রুপকে বলে Rhesus factor। পোলিও, বসন্ত, জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগের ভ্যাকসিন তৈরিতে বাঁদরের অবদান অনস্বীকার্য। ২০০০ সালে প্রথম বাঁদরের Clone করা হয়েছে। জন্ম হয়েছে Tetra-র। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে জেলিফিসের জিন বাঁদরের দেহে উপস্থাপন করে তৈরি করা হয়েছে ট্রান্সজেনিক বাঁদর (Transgenic Primate), ANDi।

মাঠে, ঘাটে, হাটে যে বাঁদর আমরা দেখতে পাই সেটি রিসাস বাঁদর (Rhesus macaque)। এদের বিজ্ঞান সম্মত নাম *Macaca mulatta*। ভারত ভূখণ্ড সমেত এশিয়া মহাদেশের প্রায় সব দেশেরই এদের দেখা যায়। অবশ্যই সুন্দরবন বাদ যায় না। ভারত এবং বাংলাদেশের সুন্দরবনে এদের অবাধ বিচরণ। ঘাসের জঙ্গলে, বড় গাছের বনাঞ্চলে, পাহাড়-পর্বত, এমনকি মরু অঞ্চলেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে মনুষ্য বসতি এরা পছন্দ করে মানুষের পরিত্যক্ত খাবারের জন্য। তাই শহরাঞ্চল বিশেষ করে হিন্দু দেবস্থানে এরা ভীড় করে।

বাঁদর সাঁতারে পটু। লম্বা সাঁতার দিতে পারে এরা। কয়েক দিনের শিশু বাঁদরকেও সাঁতার কাটতে দেখা যায়। তবে অগভীর পানীয় জলের উৎসে একাধিক বানরকে ডুবে মারা যেতে দেখা গেছে। আপাতদৃষ্টিতে এর সদ্‌উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাঁদরের রং ধূসর বা বাদামী, হালকা লালচে মুখমণ্ডলে লম্বা লোম রয়েছে। লেজ খুব একটা লম্বা হয় না-৮/৯ ইঞ্চি। পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বাঁদর লম্বায় দু-ফুটের কিছু কম (২১ ইঞ্চি), ওজন ৭-৮ কেজির মত। স্ত্রী বাঁদর অপেক্ষাকৃত ছোট, ১৯ ইঞ্চি লম্বা। ওজন ৫-৫.৫ কেজি। দাঁতের সংখ্যা ৩২, যথার্থই বত্রিশপাটি! এরা দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। এক একটি দলে কমবেশি ২০-২০০টি বাঁদর থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই দলে মহিলা বাঁদরের সংখ্যা বেশি থাকে। আনুপাতিক হারে মহিলা ঃ পুরুষ - ৪ ঃ ১।

রিসাস বাঁদর মূলত নিরামিশাষী, ফল এদের বড়ই প্রিয়। তবে শষ্যের বীজ, গাছের শিকড়, ছাল এরা খাবার হিসাবে গ্রহন করে। গাছের অগ্র মুকুল বা ফুলের কুঁড়ি খেতে এরা ওস্তাদ। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মোটামুটি শতখানেকপ্রজাতির উদ্ভিদ এদের খাদ্য। নানা ধরনের পোকামাকড় যেমন উইপোকা, পিঁপড়ে, ঘাসফড়িং, গুবরেপোকা এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে থাকে। পাকা এবং রসালো ফল খেয়ে এরা তৃষ্ণা মেটায়। তবে শিশির ভেজা পাতা চাটতে বা গাছের কোটরে জমা জল খেতেও এদের দেখা যায়।

বাঁদরের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে গলার স্বর, মুখের ভাব এবং দেহের বিশেষ ভঙ্গিকে কাজে লাগায়। তবে মুখ দিয়ে শব্দ না করে শুধুমাত্র দাঁত দেখিয়ে একটি দলের উচ্চপদাধিকারী বাঁদরের সঙ্গে নিম্নপদাধিকারীর যোগাযোগ ঘটে। দলের মুখ্য বাঁদর অর্থাৎ পালের গোদা লেজ উপরের দিকে সোজা করে চার হাত পা মাটিতে রেখে দাঁত খিঁচিয়ে উগ্রস্বভাব প্রদর্শন করে। অপর দিকে পা তুলে দেহের নিম্নাঙ্গ প্রদর্শন করিয়ে পালের গোদার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নেয় অন্য বাঁদরেরা।

স্ত্রী বাঁদর ৪ বছর থেকে শুরু করে ২৫ বছর পর্যন্ত সন্তান ধারনে সক্ষম হয়। শিশু পালনে মা এবং বোনেদের ভূমিকাই মুখ্য। পুরুষ বাঁদরেরা শিশুপালনে সাধারনত অংশগ্রহন করে না।

লেখক বর্ধমান রাজ কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান।

ফল সহ ধুঁদুল গাছ

ধুঁদুল

সৌমিক মিত্র

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Xylocarpus granatum*
Family - Meliaceae

স্থানীয় ভাষায় গাছটিকে ধুঁদুল বলা হয়। এটি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ বা জোয়ার ভাঁটার অরণ্যের উদ্ভিদ হলেও সাধারণত জোয়ার ভাঁটার অরণ্যের উচ্চস্তরে একে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরণের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গাছটির অঙ্কুরোদগমের সময় লবন জলের থেকেও পরিস্কার মিষ্টি জল বেশি প্রয়োজন। যদিও লবণের বিভিন্ন ঘনত্বের তারতম্যে বীজ নষ্ট হওয়ার হার একই তবু শুধুমাত্র অঙ্কুরোগমের সময় এটা প্রমাণিত, যে গাছটি লবণ সহ্য করতে পারে না। শুধু লবণের অতিরিক্ততা নয় গাছটির বেড়ে ওঠার পিছনে আর একটি প্রধান বাধা হল ছায়া। এই কারণে দেখা গেছে, যে সমস্ত স্থানে বড় বড় গাছ দ্বারা নির্মিত ক্যানোপি নেই সেই সমস্ত স্থানে এরা খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে। তবে এটা ঠিক যে প্রকৃতির খেয়ালে এই সমস্ত বাধা দূর করে গাছটি বেড়ে ওঠার পর বাধাগুলো আর বাধা থাকে না। তখন এরা প্রকৃত অর্থেই ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ হয়ে ওঠে।

এটি একটি চিরহরিৎ বৃক্ষ, ২০-২৫ মি উচ্চতা বিশিষ্ট কাণ্ডের গুঁড়িতে সাধারণত অল্প শাখাপ্রশাখা থাকে। কাণ্ডের ত্বক মসৃন, হালকা হলুদ কিংবা বাদামী রঙের মাঝে খোলস ওঠা এবং কালো দাগযুক্ত হয়। কাণ্ডের মাটি সংলগ্ন স্থানে অধীমূল গঠন করেও পরবর্তী সময়ে এই বৃক্ষ প্রায় ২৫মিটার উচ্চতার হয়। বীজের ভ্রুণমুকুল বৃদ্ধি পেয়ে বীজের মধ্যে বীজপত্রাবকান্ড গঠিত হয়।